কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 23 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

প্রাথমিকে শিক্ষক-দুর্গতি মেধাহীনতা

গোড়ায় গলদ

- ৪২% শিক্ষকই অপ্রশিক্ষিত, বেশির ভাগের এটি দ্বিতীয় পেশা
- গলার কাঁটা নতুন জাতীয়করণ হওয়া ২৬ হাজার বিদ্যালয়
- কিন্ডারগার্টেনে মান আরো খারাপ, কারো কারো বেতন ৫০০ টাকা
- শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বেতন বাড়ানোর তাগিদ

শরীফুল আলম সুমন ▷

সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার প্রায় পুরোটাই হাওর। সেখানকার মানুষের 'বর্ষায় নাও হেমন্তে পাও'। কারণ এলাকাটি ছয় মাসই থাকে বলতে গেলে পানির নিচে। আর শুকনো মৌসুমেও বেশির ভাগ এলাকায় হেঁটে চলাফেরা করতে হয়। সম্প্রতি বেহেলী ইউনিয়নের হরিণাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হাওরিয়া আলীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘুরে দেখা যায়, দুটি স্কুলে মাত্র তিনজন শিক্ষক উপস্থিত। স্কুল দুটিতে শিক্ষকের মোট পদ আটটি। নিয়োজিত আছেন পাঁচজন। দুটি স্কুলে দুজন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলেও তাঁদের ছুটির বৈধ আবেদন দেখাতে পারেননি প্রধান শিক্ষকরা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাড়ির কাছেই শিক্ষকদের পোস্টিং দেওয়া হলেও তাঁরা থাকেন উপজেলা সদরে। ওই এলাকার অন্য শিক্ষকদের অবস্থাও একই রকম বলে জানা যায়। তাঁরা শিক্ষকতা করলেও সেটা তাঁদের প্রধান পেশা নয়। অনেকেই ব্যবসা কিংবা কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। ওই সব কাজে সময় দিতে গিয়ে শিক্ষকরা পরস্পর যোগসাজশে প্রায়ই ছুটি না নিয়েই স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন। আবার যেদিন হাজির থাকেন সেদিনও সময়মতো যান না। ওই এলাকার শিক্ষার্থীরাও পাঠ্যবই নিয়ে স্কুলে যায় না। সবার হাতে থাকে গাইড বই। হরিণাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র মো. রাহিম কালের কণ্ঠকে বলে, 'আফায়ও আমরারে গাইড দেইখ্যাই পড়ান। হের লাইগ্যা স্কুলেও এইডা লইয়্যা আইছি।' এতে সহজেই ওই এলাকার প্রাথমিক শিক্ষকদের দক্ষতা ও মানের দৈন্য দশা বোঝা যায়।

শিক্ষার তিনটি স্তরের মধ্যে প্রাথমিকেই শিক্ষকতার মান সবচেয়ে খারাপ। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেশির ভাগই অন্য কোনো চাকরি না পেয়ে সবশেষে আসেন এই পেশায়। বেতনের দিক দিয়ে প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকরা এখনো প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী। ফলে মেধাবীরা আসছেন না এই পেশায়। তুলনামূলকভাবে মেধাবী কেউ কেউ সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেলেও অল্প দিনের মধ্যেই তাঁরা চলে যান উচ্চতর বেতনের অন্য চাকরি নিয়ে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুযোগও খুব কম। ইউনেসকোর এক প্রতিবেদন মতে, দেশে প্রাথমিকে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার মাত্র ৫৮ শতাংশ। বাকি ৪২ শতাংশ শিক্ষকই অপ্রশিক্ষিত। ২০১৩ সালে জাতীয়করণ হওয়া

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

গোড়ায় গলদ

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা আরো ভয়াবহ। ২০১২ সাল পর্যন্ত দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার। ২০১৩ সালে রেজিস্টার্ড, কমিউনিটিসহ বিভিন্ন ধরনের ২৬ হাজার বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয় একযোগে। এই বিদ্যালয়গুলোই এখন গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এসব স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে নিয়মকানুনের কোনো বালাই ছিল না। পরিচালনা কমিটি টাকার বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। বেশির ভাগ সহকারী শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি, আর প্রধান শিক্ষকদের এইচএসসি। তাঁরা এখন মূল ধারায় এসে তাল মেলাতে পারছেন না। জাতীয়করণ করার পর এসব বিদ্যালয়ের এক লাখ চার হাজার শিক্ষকের দিকে বিশেষ নজর দেয়নি সরকারও। ফলে মানের দিক দিয়ে অনেকখানিই পিছিয়ে আছেন তাঁরা। এ ছাড়া দেশের শিশুদের একটি বড় অংশ ৩০ হাজার কিন্ডারগার্টেনে পড়লেও তাদের শিক্ষকদের মান সবচেয়ে খারাপ। কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষকদের কোনো প্রশিক্ষণই নেই। এমনকি নিয়োগ দেওয়ার সময় কত কম টাকায় শিক্ষক পাওয়া যায়, সেই চিন্তাই করা হয়। বেশির ভাগ শিক্ষক এখনো এসএসসি পাস। তাঁদের বেতন ৫০০ টাকা থেকে দুই হাজার টাকার মধ্যে।

শিক্ষাবিদরা বলেছেন, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি নির্ভর করে শিক্ষকদের ওপর। সেই শিক্ষকদের মানই যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয় তাহলে শিক্ষার মানও বাড়বে না। শিক্ষকদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ না থাকলে তাঁরা পাঠদানের মান নিশ্চিত করতে পারবেন না। সরকারের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি প্রদান, বিনা মূল্যের বই প্রদানসহ নানা পদক্ষেপের ফলে শতভাগ শিশুই বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। ঝরে পড়ার হারও ২১ শতাংশে নেমে এসেছে। কিন্তু দক্ষ শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় শিক্ষকদের মান বাড়াতে তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বেতন বাড়ানো জরুরি।

১৩% শিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্ন বোঝেনই না, ৪২% কিছুটা বোঝেন : রিসার্চ ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব কমপ্লিট এডুকেশনের এক জরিপে প্রাথমিক শিক্ষকদের মানের দৈন্য ফুটে উঠেছে। গত মাসে প্রকাশিত ওই জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাথমিকের শতকরা ১৩ ভাগ শিক্ষক পুরোপুরি সৃজনশীল বা যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন বোঝেন না। শতকরা ৪২ ভাগ শিক্ষক সীমিত পরিসরে নিজেরা বুঝলেও ক্লাসে বোঝাতে পারেন না, বাকি ৪৫ শতাংশ বোঝেন। সৃজনশীল না বোঝায় শতকরা ৪৭ ভাগ শিক্ষক বাজারের গাইড বইয়ের ওপর নির্ভর করেন।

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে পিছিয়ে : ইউনেসকোর এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল ব্যুরো ফর এডুকেশন সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবেই শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ। প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার মাত্র ৫৮ শতাংশ। বাকি ৪২ শতাংশ শিক্ষকই অপ্রশিক্ষিত। অথচ প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের হার প্রতিবেশী দেশ নেপালে ৯০ শতাংশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় ৮২ শতাংশ, মালদ্বীপে ৭৮ শতাংশ এবং মিয়ানমারে শতভাগ। বাংলাদেশে প্রতিদিন ১২ থেকে ১৩ শতাংশ শিক্ষক অনুপস্থিত থাকেন বিদ্যালয়ে।

২০১৫ সালের এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৯৮ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষকের হার ছিল ৪৮.৩ শতাংশ, ২০১৪ সালে বেড়ে হয়েছে ৫৭.২ শতাংশ। তবে নতুন জাতীয়করণ করা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই হার ২৬.১ শতাংশ, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে মাত্র ৮ শতাংশ এবং এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেশির ভাগই মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেছেন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত মৌলিক প্রশিক্ষণ (সিইনএড, বিএড, এমএড) ছিল ৬৫.৯ শতাংশ শিক্ষকের। কিন্ডারগার্টেন ও এবতেদায়ি মাদ্রাসায় এই হার যথাক্রমে ১৫ ও ৭ শতাংশ।

বেতনেও পিছিয়ে : ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ৩৫ হাজার টাকার ওপরে এবং তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী। বাংলাদেশে এত দিন প্রাথমিক শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা ছিল মেয়েদের ক্ষেত্রে এসএসসি এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে এইচএসসি ও সমমানের। দুই বছর আগে তা উন্নীত করে যথাক্রমে এইচএসসি ও স্নাতক করা হয়েছে। সপ্তম জাতীয় বেতন স্কেলে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতন ছিল প্রায় আট হাজার টাকা। অষ্টম বেতন স্কেলে তা বেড়ে এখন দ্বিগুণ হয়েছে।

শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বাংলাদেশের ১৬ কোটি জনসংখ্যার বড় একটি অংশের বয়স ১০ বছরের নিচে। তারাই হবে ভবিষ্যতের জ্ঞানসমৃদ্ধ আলোকিত বাংলাদেশের বিনির্মাতা। এ জন্য দরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা। গুণগত শিক্ষা দিতে হলে যোগ্য ও মেধাবীদের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে হবে। কিন্তু যাঁরা শিক্ষকতায় আসছেন তাঁদের একটি বড় অংশ ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগ পান। এটা বন্ধ করার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্পূর্ণ ভিন্ন ও উচ্চতর বেতন কাঠামো দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বেতন হতে হবে প্রথম শ্রেণির চাকরিজীবীদের বেতনের চেয়ে কমপক্ষে এক টাকা বেশি।'

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি-২০১০-এর সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রাথমিকে আমরা উন্নয়নের দিকে যাচ্ছি, তবে সেটা গুণগত মানের উন্নয়ন নয়। বিদেশে শিক্ষকতা পেশায় আসার আগেই প্রশিক্ষণ নিতে হয়, কিন্তু আমাদের দেশে আসার পরেও হয় না। আর যেটা হয় সেটাও সময়োপযোগী নয়। এখন যেটা করা দরকার তা হচ্ছে শিক্ষকদের মানের

পরিমাপ করা। এরপর ধরন অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষকদের স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণে পরবর্তী নিয়োগ কার্যক্রমে তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতারও আপগ্রেড করা উচিত। আর মহিলা শিক্ষকরা যাতে বিদ্যালয়ের কাছে থাকেন সে জন্য দুর্গম এলাকায় তাঁদের জন্য হোস্টেলও থাকা উচিত।'

জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর কালের কণ্ঠকে বলেন, "টাকা হলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো যায় কিন্তু শিক্ষার মানোন্নয়ন হয় না। এ জন্য সময়ের দরকার। দরকার দক্ষ শিক্ষকের। এমডিজির শর্ত অনুযায়ী আমাদের টার্গেট ছিল শতভাগ শিশুকে স্কুলে আনা, সেটা আমরা পেরেছি। এবার এসডিজির টার্গেট অনুযায়ী মান বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছি। বর্তমানে শিক্ষক নিয়োগে শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ানো হয়েছে। তবে সদ্য জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মান অন্যদের চেয়ে খারাপ। তাই তাঁদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে এ জন্যও সময় প্রয়োজন। এসব বিদ্যালয় থেকে আগের সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বদলি করেও সমন্বয় করা হচ্ছে।'

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে ২৪ ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, যার সংখ্যা এক লাখ ছয় হাজার ৮৫৯। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক আছেন পৌনে পাঁচ লাখ। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের এনজিও পরিচালিত স্কুল, বেসরকারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন রয়েছে, যাতে প্রায় এক কোটি ৯৫ লাখ ৮৪ হাজার শিশু পড়ালেখা করে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৩ হাজারের বেশি। এতে প্রায় সোয়া তিন লাখ শিক্ষক আছেন, যাঁদের ৬৪ শতাংশই নারী।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে এসএসসি ও সমমান পাস করা প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষক রয়েছেন দেশের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তখন এসএসসিতে ৫০ নম্বরের রচনামূলক ও ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা নেওয়া হতো। তবে প্রতিটি বিষয়ের ৫০০টি নৈর্ব্যক্তিক নির্দিষ্ট করে দেওয়া ছিল। সেখান থেকেই ৫০টি আসত। ওই পাঁচ বছরে রচনামূলকে পাস করা লাগত না। নৈর্ব্যক্তিকে পাস করলেই পাস। ওই সময় ন্যূনতম স্বাক্ষরজ্ঞান থাকা একজন শিক্ষার্থীর পক্ষেও এসএসসি পাস করা সম্ভব ছিল। অথচ সেই সময়ে এসএসসি পাস করা অনেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতা করছেন। তাঁদের প্রশিক্ষণ বলতে চাকরির পর এক বছরের একটি কোর্স। ফলে তাঁদের মান নিয়ে প্রশ্ন দীর্ঘদিন থেকেই। কিন্তু সরকারও তাঁদের দক্ষতা বাড়াতে নেয়নি বিশেষ কোনো ব্যবস্থা।